এবং এখানেই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্র করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)।

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। এক. মূসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং দুই. ঈসা (আ)-র নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা ছিল এই ঃ তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফির শত্রু বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মূসা (আ)-র শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ঈসা (আ)-র আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায় দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে. উভয়ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

এ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا — অর্থাৎ তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মূসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয় বার ঈসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি

ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে-মুহাম্মদীয় যুগ যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং পয়গম্বরগণের এ কিবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ ॥ বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা, এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ ঃ বনী ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, মুসলমানগণ এ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থসম্পদ ও আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফির-দেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদ-সমূহেরও অবমাননা হবে।

সাম্প্রতিককালে বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর ইহুদীদের অধিকার এবং তাতে অগ্নি-সংযোগের হৃদয়বিদারক ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে উদ্বেগাকুল করে রেখেছে। সত্য বলতে কি, এতে করে কোরআনের উপরোক্ত বক্তব্যেরই সত্যায়ন হচ্ছে। মুসলমানগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে বিস্মৃত হয়েছে, পরকাল থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব শান-শওকতে মনোনিবেশ করেছে এবং কোরআন ও সুন্নাহ্র বিধি-বিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ্র কুদরতের সেই বিধানই আত্মপ্রকাশ করেছে যে, কোটি কোটি আরবের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ ইহুদী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা আরবদের ধনসম্পদের বিস্তর ক্ষতি সাধান করেছে এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠতম মসজিদের একটি মসজিদ---যা সব সময়ই পয়গম্বরগণের কিবলা ছিল---আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে জাতি বিশ্বে সর্বাধিক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বলে গণ্য হত, আজ সে ইহুদী জাতিই আরবদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি দেখা যায়, এ জাতি সংখ্যায় মুসলমানদের মুকাবিলায় কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং মুসল-মানদের সমষ্টিগত সমরাস্ত্রের মুকাবিলায়ও ওদের কোন গুরুত্ব নেই। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনাটি ইহুদীদেরকে কোন সম্মানের আসন দান করে না। তবে এটা মুসলমানদের অবাধ্যতার শাস্তি অবশ্যই। এ থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, যা কিছু ঘটেছে, তা আমাদের কুকর্মের শাস্তি হিসাবেই ঘটেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে যদি আমরা স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তওবা করি, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করি, সাচ্চা মুসলমান হয়ে যাই, বিজাতির অনুকরণ

ও বিজাতির উপর ভরসা করা থেকে বিরত হই, তবে ওয়াদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ্ বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন আবার আমাদের অধিকারভুক্ত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার আরব শাসকবর্গ এবং সেখানকার মুসলমান জনগণ এখনও এ সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা এখন বিজাতির সাহায্যের উপর ভরসা করে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরী করছে। অথচ বাহ্যত এর কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। فا الله المشتكى

যে অস্ত্র-শস্ত্র ও সমরোপকরণ দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন পুনরায় মুসলমানদের অধিকারে আসতে পারে, তা হচ্ছে শুধু আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন, পরকালে বিশ্বাস, শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ, নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে বিজাতির উপর ভরসা ও তাদের অনুকরণ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুনরায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করে খাঁটি ইসলামী জিহাদ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আরব শাসকবর্গকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে এর তওফীক দান করুন।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে ইবাদতের জন্য দু'টি স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল মোকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্র আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফিরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের খৃস্টান বাদশাহ্ বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসাবে তাদের কাছ থেকে এ কিবলাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফিররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফির আল্লাহ্র বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় ঃ উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহ্র দীনের অনুসারীরা যখন ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে--- عِبَادُنَا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্র দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ-এর অধীনে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু عبد (বান্দা) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে বান্দা বলে আখ্যায়িত করা। বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফির। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে عبادنا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে اضافت তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عبادًا لّنا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানব-মণ্ডলীই আল্লাহ্র বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের اضافت তথা সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে হতে পারে।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا ۝ وَّأَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۝ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ
بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝

(৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম-পরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততাপ্রিয়।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরার প্রারম্ভে মি'রাজের মু'জিযার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআনের মু'জিযার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় কোরআন এমন পথ নির্দেশ করে, যা সম্পূর্ণ সরল (অর্থাৎ ইসলাম) এবং এ পথ মান্যকারী ও অমান্যকারীদের প্রতিদান ও শাস্তিও ব্যক্ত করে) সৎ কর্ম সম্পাদনকারী মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তারা বিরাট সওয়াব পাবে এবং আরও বলে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। কিছু মানুষ (যেমন, কাফিররা) অমঙ্গলের (অর্থাৎ আযাবের) এমন দোয়া করে, যেমন মঙ্গলের দোয়া (করা হয়)। মানুষ (স্বভাবতই) কিছুটা দ্রুততাপ্রিয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'আকওয়াম' পথঃ কোরআন পাক যে পথ নির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।---(কুরতুবী) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব-জীবনের জন্য যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসংকুল মনে করতে থাকে; কিন্তু রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশি। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভাল-মন্দও পুরোপরি জানতে পারে না।

সম্ভবত এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্য এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে সে নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণাম-দর্শিতায় ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে,

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় 'ইনসান' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝতে হবে।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ

النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ
الْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ
طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾
اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَّنِ اهْتَدَىٰ
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

(১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিষ্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সৎ পথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি রাত ও দিনকে স্বীয় কুদরতের নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শন (অর্থাৎ স্বয়ং রাত্রি)-কে আমি নিষ্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করেছি (যেন এতে যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সহজেই দেখা যায়), যাতে (তোমরা দিনের বেলায়) পালনকর্তার রুযী অন্বেষণ কর এবং (দিবারাত্রির গমনাগমন, উভয়ের রঙের পার্থক্য---একটি উজ্জ্বল ও অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং উভয়ের পরিমাণের বিভিন্নতা দ্বারা) বছরসমূহের গণনা এবং (অন্যান্য ছোটখাট) হিসাব জেনে নাও। (যেমন সূরা ইউনুসের প্রথম রুকূতে বর্ণিত হয়েছে)। আমি প্রত্যেক বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (লওহে মাহ্ফুযে সমগ্র সৃষ্টবস্তুর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোরআন পাকেও প্রয়োজনীয় বিবরণ রয়েছে। কাজেই এ বর্ণনা উভয়টির সাথেই সম্পর্কযুক্ত হতে পারে)। এবং আমি প্রত্যেক (আমলকারী) মানুষের আমলকে (সৎ হোক কিংবা অসৎ) তার গলার হার বানিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক আমল তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত)।

এবং (অতঃপর) আমি কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার (দেখার) জন্য বের করে সামনে দেব; যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখবে। (এবং তাকে বলা হবে যে) নিজের আমলনামা (নিজেই) পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। (অর্থাৎ তোমার আমল অন্য কেউ গণনা করবে, এর প্রয়োজন নেই; বরং তুমি নিজেই নিজের আমলনামা পড়ে যাও এবং হিসাব করে যাও যে, তোমার কি পরিমাণ শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, এখনও আযাব সামনে না এলেও তা টলবে না। এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ নিজের সব কাজকর্ম খোলা চোখে দেখতে পাবে এবং আযাবের যুক্তিযুক্ত প্রমাণ তার বিরুদ্ধে কায়েম হয়ে যাবে এবং) যে ব্যক্তি (দুনিয়ার সোজা) সরল পথে চলে, সে নিজের উপকারার্থেই চলে এবং যে ব্যক্তি বিপথগামী হয় সে-ও নিজেরই ক্ষতির জন্য বিপথগামী হয়। (সে তখন এর সাজা ভোগ করবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আমার আইন এই যে) কারও (পাপের) বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না (এবং যাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়, তা তার কাছে সপ্রমাণ করার পর দেওয়া হয়। কেননা, আমার আইন এই যে) আমি (কখনও) শাস্তি দান করি না, যে পর্যন্ত না (তার হিদায়তের জন্য) কোন রসূল প্রেরণ না করি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহকে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক. দিনের আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে। মেহ্নত, মজুরি, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্য আলো অত্যাবশ্যক। দুই. দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণত ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরি, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ ঃ মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের

যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবূ উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎ কর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরয করবে ঃ পরওয়ারদিগার! এতে আমার অমুক অমুক সৎ কর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে ঃ —আমি সে সব সৎ কর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতে।—(মাযহারী)

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়ার ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতদৃষ্টে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি—সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহ্‌র কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন; রসূল ও নবী অথবা তাদের কোন প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল বটে।

মুশরিকদের সন্তান-সন্ততির আযাব হবে না ঃ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফিরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, পিতামাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ প্রশ্নে ফিকাহ্‌বিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

(১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়ত সম্বলিত বাণী না পৌঁছাত

এবং এরপরও তারা আনুগত্য প্রকাশ না করত, সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করতেন না। এটা আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিপরীত দিকটি বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র রসূল ও তাঁর পয়গম্বর পৌঁছে যাওয়ার পর যখন কোন সম্প্রদায় অবাধ্য আচরণ প্রদর্শন করে, তখন সে সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যাপকভাবে আযাব প্রেরণ করা হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আমি কোন জনপদকে (যা কুফ্রী ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্র রহস্যের তাগিদ অনুযায়ী ধ্বংস করার যোগ্য হয়) ধ্বংস করতে চাই, তখন সেটিকে পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে ধ্বংস করি না, (বরং কোন রসূল মারফত) সে জনপদের সম্পন্ন (অর্থাৎ ধনী ও নেতৃস্থানীয়) লোকদেরকে (বিশেষ করে এবং জনগণকে সাধারণভাবে ঈমান ও আনুগত্যের) নির্দেশ দেই। অতঃপর (যখন) তারা (আদেশ মান্য না করে, বরং) সেখানে পাপাচারে মেতে উঠে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেই জনপদকে নাস্তানাবুদ করে দেই। (এ রীতি অনুযায়ী) অনেক উম্মতকে নূহ (আ)-র (যুগের) পর (তাদের কুফরী ও গোনাহ্র কারণে) ধ্বংস করেছি, [যেমন, 'আদ', সামূদ ইত্যাদি। কওমে নূহের বন্যায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া তো সুবিদিত। তাই শুধু مِنْ بَعْدِ نُوحٍ বলা হয়েছে এবং স্বয়ং কওমে নূহের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এ কথাও বলা যায় যে, সূরার প্রারম্ভে ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ আয়াতে حَمَلْنَا শব্দের মধ্যে নূহ (আ)-র মহাপ্লাবনের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সেটাকে কওমে নূহের ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনা সাব্যস্ত করে এখানে নূহের পরবর্তী যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।] আপনার পালনকর্তা বান্দাদের গোনাহ্ জানা ও দেখার জন্য যথেষ্ট। (সেমতে কোন সম্প্রদায়ের যে ধরনের গোনাহ্ হয়, তিনি সে ধরনের সাজাই দান করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ اِذَا اَرَدْنَا এবং অতঃপর اَمَرْنَا বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের কারণ বানানো এ সব তো আল্লাহ্ তা'আলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারক ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি তরজমা ও তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফ্রী ও গোনাহের সংকল্প---আল্লাহ্র ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

আয়াতের অন্য একটি তফসীর ঃ أَمَرْنَا শব্দের প্রচলিত অর্থ তাই, যা উপরে বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি আদেশ দেই। কিন্তু এ আয়াতে এ শব্দের বিভিন্ন কিরা'আত হয়েছে। আবূ ওছমান নাহ্দী, আবূ রাজা, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ অবলম্বিত এক কিরা'আতে এ শব্দটি মীমের তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ আমি অবস্থাপন্ন বিত্তশালী লোকদেরকে প্রভাবশালী ও শাসক করে দেই। তারা পাপাচারে মেতে উঠে এবং গোটা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক কির'আত শব্দটিকে أَمَّرْنَا পাঠ করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে এর তফসীর أَكْثَرْنَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব প্রেরণ করেন, তখন তার প্রাথমিক লক্ষণ এই প্রকাশ পায় যে, সে জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী লোকদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়। তারা পাপাচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আযাবে পতিত করার কারণ হয়ে যায়।

প্রথম কির'আতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ভোগবিলাসী লোকদের শাসনকার্য অথবা এ ধরনের লোকের প্রাচুর্য মোটেই আনন্দের বিষয় নয় বরং আল্লাহ্র আযাবের লক্ষণ। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে আযাবে পতিত করতে চান, তখন এর প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে জাতির শাসনকর্তা ও নেতৃপদে এমন লোকদেরকে অধিষ্ঠিত করে দেন, যারা বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সেবী। অথবা শাসনকর্তা না হলেও জাতির মধ্যে এ ধরনের লোকের আধিক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। উভয় অবস্থার পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তারা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে আল্লাহ্র না ফরমানী নিজেরাও করে এবং অন্যদের জন্যও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অবশেষে তাদের ওপর আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ঃ আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ধন দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য

ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَرَادَ
الْاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ
رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ
اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সে সব লোককে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (২০) এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি (স্বীয় সৎ কর্ম দ্বারা শুধু) ইহকালের (উপকারের) নিয়ত রাখবে (হয় এ কারণে যে, সে পরকালে বিশ্বাসী নয়, না হয় এ কারণে যে, সে পরকাল সম্পর্কে গাফিল) আমি তাকে ইহকালেই যতটুকু ইচ্ছা (তাও সবার জন্য নয়; বরং) যাকে ইচ্ছা নগদ দিয়ে দেব। (অর্থাৎ ইহকালেই সে কিছু প্রতিদান পেয়ে যাবে)। অতঃপর (পরকালে কিছুই পাবে না; বরং সেখানে) আমি তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করব। সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি (স্বীয় কৃতকর্মে) পরকালের (সওয়াবের) নিয়ত রাখবে এবং এর জন্য যেরূপ চেষ্টা করা দরকার, তদ্রূপ চেষ্টা করবে (উদ্দেশ্য এই যে, যে কোন চেষ্টা উপকারী নয়; বরং যে চেষ্টা শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী, শুধু তাই উপকারী। কেননা, এরূপ চেষ্টারই আদেশ করা হয়েছে।- যে কর্মও প্রচেষ্টা শরীয়ত ও সুন্নতের পরিপন্থী তা গ্রহণযোগ্য নয়। শর্ত এই যে, সে ঈমানদারও হবে) এমন লোকদের

চেল্টাই গ্রহণীয় হবে। (মোট কথা, আল্লাহ্‌র কাছে সফলকাম হওয়ার শর্ত চারটি। এক. নিয়ত শুদ্ধ করা অর্থাৎ খাঁটি পরকালীন সওয়াবের নিয়ত করা---মানসিক স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। দুই. নিয়তের জন্য না করার প্রয়াস। শুধু নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় না, যে পর্যন্ত তাঁর জন্য কাজ না করা হয়। তিন. কর্মসিদ্ধ করা। অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী কর্মপ্রয়াস পরিচালনা। কেননা, অভীল্ট লক্ষ্যের বিপরীত দিকে দৌঁড়ানো ও এতদুদ্দেশ্যে চেল্টা চালিয়ে যাওয়া উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অভীল্ট লক্ষ্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। চার. বিশ্বাস। অর্থাৎ ঈমান শুদ্ধ করা। এ শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবগুলোর মূল ভিত্তি। এসব শর্ত ব্যতীত কোন কর্মই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কাফিরদের জন্য পার্থিব নিয়ামতসমূহ অর্জিত হওয়া তাদের কর্মের গ্রহণীয়তার লক্ষণ নয়। কেননা, পার্থিব নিয়ামত আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের জন্য নির্দিল্ট নয়; বরং) আপনার পালনকর্তার (পার্থিব) দান থেকে আমি তাদেরকেও (অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদেরকেও) সাহায্য করি (এবং তাদেরকেও। অর্থাৎ অপ্রিয় বান্দাদেরকেও সাহায্য করি)। আপনার পালনকর্তার (পার্থিব) দান (কারও জন্য) বন্ধ নয়। দেখুন আমি (পার্থিব দানে ঈমান ও কুফরের শর্ত ব্যতিরেকে) একজনকে অপরের ওপর কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি! (এমনকি, অধিকাংশ কাফির অধিকাংশ মু'মিনের তুলনায় অধিক ধনসম্পদের মালিক। কেননা, এসব বস্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়)। অবশ্যই পরকাল (যা প্রিয় বান্দাদের জন্য নির্দিল্ট, তা) মর্তবা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিরাট। (তাই এর জন্য যত্নবান হওয়া উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, আলোচ্য আয়াতে তাদের এবং তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ ---বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা استمرار ودوام ক্রমাগত বলতে থাকা ও স্থায়ী হওয়া বুঝায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই আচ্ছন্ন করে রাখে---পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় أَرَادَ الْآخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মু'মিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফির বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল মু'মিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিদ'আত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক---গ্রহণযোগ্য নয় ঃ এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سعيها শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্‌ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎ কর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়---সাধারণ বিদ'আতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন---পরকালের জন্য উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তফসীর রূহুল মা'আনী سعيها শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে এ কথা ও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না---এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا
تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ
اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۭ ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ
فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

(২২) স্থির করো না আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল ঃ হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, ঈমানসহ এবং শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী যে কর্ম করা হয়, তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শরীয়ত বর্ণিত। এসব নির্দেশের বাস্তবায়ন পরকালের সাফল্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ পরকালের ধ্বংসের কারণ। যেহেতু উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে ঈমানের শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বপ্রথম সে নির্দেশ ও তওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথম নির্দেশ তওহীদ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ---হে সম্বোধিত ব্যক্তি)

আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (অর্থাৎ শিরক করো না)। তাহলে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় হয়ে পড়বে। (অতঃপর এই তাগিদ করা হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সত্য উপাস্য তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। (এটা পরকালের চেষ্টার পন্থা সংক্রান্ত বিবরণ)।

(দ্বিতীয় নির্দেশ পিতামাতার হক আদায় করা وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا)

তোমার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি (তারা) তোমার কাছে (থাকে এবং) তাদের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে (অর্থাৎ বার্ধক্যের বয়সে) উপনীত হয় এবং সে কারণে সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং যখন স্বভাবতই তাদের সেবাযত্ন করা কঠিন মনে হয়, তবে (তখনও এতটুকু আদব কর যে) তাদেরকে (হ্যাঁ থেকে) হুঁ-ও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে খুব আদব সহকারে কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে সবিনয়ে ইয্‌যত-সম্মান করে দাও এবং (তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে) এরূপ দোয়া কর ঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (শুধু এই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শনকেই যথেষ্ট মনে করো না। অন্তরেও তাদের প্রতি আদব ও আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করবে। কেননা) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনের কথা খুব জানেন। (একারণেই এর বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য একটি হাল্কা আদেশও শুনাচ্ছেন যে) যদি তোমরা (প্রকৃতই আন্তরিকভাবে) সৎ হও, (এবং ভুলক্রমে, মেযাজের সংকীর্ণতাহেতু কিংবা বিরক্তিবশত কোন বাহ্যিক ত্রুটি হয়ে যায়, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নাও) তবে তওবাকারীদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পিতামাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার

করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে ফরয করেছেন। যেমন সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতামাতার শোকরকে একত্র করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার শোকর কর এবং পিতামাতারও।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলঃ আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলঃ এরপর কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার।---(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফযীলতঃ মসনদে আহমদ। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাক হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিফাযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবূ উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলঃ সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেনঃ তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবি ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

(৪) বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে অসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে পিতামাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতামাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলঃ জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিনবার বলেনঃ وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও

করে তবু পিতামাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টি-পাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। লোকেরা আরয করলঃ সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেনঃ হাঁা, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্! তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।

পিতামাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায়ঃ

(৬) বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে আবূ বকরার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতামাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তফসীরে মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে)।

কোন কোন বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছেঃ এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহ্‌র কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ---অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতামাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরী নয়ঃ ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা)-র একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেনঃ صلى امك অর্থাৎ "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাফির পিতামতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক বলেঃ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ---অর্থাৎ যার পিতামাতা কাফির এবং তাকেও কাফির হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

মাস'আলা ঃ যে পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কিফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জিহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল ঃ জী হ্যাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ففيهما فجاهد অর্থাৎ তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর। অর্থাৎ তাঁদের সেবাযত্নের মাধ্যমেই তুমি জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লিখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল ঃ আমি পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যাও, তাঁদের হাসাও ; যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ তাঁদেরকে গিয়ে বল ঃ এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না।---(কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে আইন না হলে এবং ফরযে-কিফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্য পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাণ দীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলিম হওয়ার জন্য সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবূ উসায়দ বদরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতামাতার ইন্তিকালের পরও তাদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতামাতার এসব হক তাঁদের **ইনতিকালের** পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা (রা)-র হক আদায় করা।

পিতামাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্ধক্যে ঃ পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতামাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়।

সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও ফরয কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবত সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোর-আন পাক এসব অবস্থায় পিতামাতার মনো-তুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ---বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতামাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক. তাঁদেরকে 'উফ'-ও বলবে না। এখানে 'উফ' শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যদ্দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উফ' বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলেও তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোট কথা, যে কথায় পিতামাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, وَلَا تَنْهَرْهُمَا শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেনঃ যেমন কোন গোলাম তার রূঢ়স্বভাব সম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ---এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جَنَاحَ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতামাতার জন্য নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয় বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার ইয্যতের পটভূমি। কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا -এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার ষোল আনা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশত তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতামাতার খিদমত করা যায়।

মাস'আলা ঃ পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা যাবেই; কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ কুরতুবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন। তিনি বললেনঃ তোমার পিতাকে ডেকে আন। এমন সময়ই জিবরাঈল আগমন করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেনঃ তার পিতা এসে গেলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো সে মনে মনে বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনতে পায়নি। যখন লোকটি তার পিতাকে নিয়ে হাযির হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ ব্যাপার কি, আপনার পুত্র আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিতে চান? পিতা বলল ঃ আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার ফুফু, খালা এবং নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত কোথায় ব্যয় করি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ إِيهٍ (অর্থাৎ ব্যস! আসল ব্যাপার জানা হয়ে গেছে। এখন আর কোন বলার শোনার দরকার নেই।) এরপর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার কানও

শোনেনি? লোকটি আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান বৃদ্ধি করে দেন। (যে কথা কেউ শোনেনি; তা আপনার জানা হয়ে গেছে। এটা একটা মু'জিযা) অতঃপর সে বলল ঃ এটা ঠিক যে, আমি মনে মনে কয়েক লাইন কবিতা বলেছিলাম, যেগুলো আমার কানও শোনেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কবিতাগুলো আমাকে শোনান। তখন সে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করল ঃ

غذوتك مولودا ومنتك يافعا
تعل بما اجنى عليك وتنهل

ঃ আমি তোমাকে শৈশবে খাদ্য দিয়েছি এবং যৌবনেও তোমার দায়িত্ব বহন করেছি। তোমার যাবতীয় খাওয়া-পরা আমারই উপার্জন থেকে ছিল।

اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت
لسقمك الا ساهرا اتململ

ঃ কোন রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, তখন আমি সারা রাত তোমার অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি।

كاني انا المطروق دونك بالذي
طرقت به دوني فعيني تهمل

ঃ যেন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে—তোমাকে নয়। ফলে আমি সারা রাত ক্রন্দন করেছি।

تخاف الردى نفسي عليك وانها
لتعلم ان الموت وقت مؤجل

ঃ আমার অন্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হত; অথচ আমি জানতাম যে, মৃত্যুর জন্য দিন নির্দিষ্ট রয়েছে—আগেপিছে হতে পারবে না।

فلما بلغت السن والغاية التي
اليها مدى ما كنت فيك اؤمل

ঃ অতঃপর যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বয়সের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছ।

جعلت جزائي غلظة وفظاظة
كانك انت المنعم المتفضل

ঃ তখন তুমি কঠোরতা ও রূঢ় ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিয়েছ; যেন তুমিই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা না করতে।

فليتك اذ لم ترع حق ابوتى
فعلت كما الجار للجار يفعل

ঃ আফসোস, যদি তোমার দ্বারা আমার পিতৃত্বের হক আদায় না হয়, তবে কম-পক্ষে ততটুকুই করতে যতটুকু একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে থাকে।

فاوليتنى حق الجوار ولم تكن
على بمال دون مالك تبخل

ঃ তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তো দিতে এবং স্বয়ং আমারই অর্থ-সম্পদে আমার বেলায় কৃপণতা না করতে!

রসূলুল্লাহ্ (সা) কবিতাগুলো শোনার পর পুত্রের জামার কলার চেপে ধরলেন এবং বললেনঃ انت ومالك لابيك অর্থাৎ যাও, তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ সবই তোমার পিতার। (কুরতুবী, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৪ পৃঃ) কবিতাগুলো আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'হামাসা'তেও উদ্ধৃত রয়েছে; কিন্তু কবির নাম লেখা হয়েছে উমাইয়া ইবনে আবুস্‌সলত। কেউ কেউ বলেনঃ এগুলো আবদুল আ'লার কবিতা এবং কারও কারও মতে কবিতাগুলো আলি আব্বাস অঙ্কের।—(হাশিয়া—কুরতুবী)

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতামাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সব সময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ ربكم اعلم بما فى نفوسكم —আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اوابين শব্দের অর্থ توابين অর্থাৎ তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিবের ছয় রাক'আত এবং ইশরাকের নফল নামাযকে صلوة الاوابين বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা اوابين অর্থাৎ توابين (তওবাকারী)।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾
اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

(২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য দু'টি আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে আরও দু'টি নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম জনগণের হক। দুই. অপব্যয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। এর সংক্ষিপ্ত তফসীর এরূপ ঃ) আত্মীয়কে তার (আর্থিক ও অন্যান্য) হক দান কর এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে (তাদের হক দাও)। (অর্থসম্পদ) অযথা ব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (অর্থাৎ শয়তানের মতই) আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিবেক-বুদ্ধিতে স্মরণ করেছেন, কিন্তু সে এই সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীর কাজে ব্যয় করেছে। এমনিভাবে অপব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অর্থসম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তারা সেগুলো আল্লাহ্র নাফরমানীতে ব্যয় করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতামাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়ের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের ওপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণ-ভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ---এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবন ধারনের মত ধনসম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের ওপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াত ঃ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়।---(তফসীরে মাযহারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিম্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র ; কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تبذير অর্থাৎ অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تبذير এবং অপরটি اسراف ---আলোচ্য আয়াতে تبذير নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوا আয়াতে اسراف নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহ্‌র কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير ও اسراف বলা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ গোনাহ্‌র কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে اسراف বলা হয়। তাই اسراف -এর চাইতে গুরুতর। تبذير -কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক মুদও (অর্ধসের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালিক (রহ) বলেন ঃ হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تبذير বলা হয়। একে اسراف -ও বলে। এটা হারাম। ---(কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تبذير এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়---এটাও تبذير -এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা تبذير -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।---(কুরতুবী)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

(২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে পঞ্চম আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় অভাবগ্রস্তদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করার ব্যবস্থা না হয় তবে তখনও তাদেরকে যেন রূঢ় ভাষায় জওয়াব না দেওয়া হয়; বরং সহানুভূতির সাথে ভবিষ্যৎ সুবিধার আশা দেওয়া হয়। তফসীর এরূপ ঃ)

এবং যদি (কোন সময় তোমার কাছে তাদেরকে দেওয়ার মত অর্থ-সম্পদ না থাকে এবং এজন্য) তোমাকে ঐ রিযিকের প্রতীক্ষায়, যা পাওয়ার আশা পালনকর্তার কাছে কর, (তা না আসা পর্যন্ত) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে (এতটুকু খেয়াল রাখবে যে) তাদেরকে নরম কথা বলে দেবে। (অর্থাৎ হাল্টচিত্ততার সাথে তাদেরকে এরূপ ওয়াদা দেবে যে, ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে কোনখান থেকে এলে দেব। পীড়াদায়ক উত্তর দেবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আন্তরিকতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারকতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

মসনদে সাঈদ ইবনে মনসূর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লিখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ
إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

(২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,---সব কিছু দেখছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তুমি নিজের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যে, চূড়ান্ত কৃপণতার কারণে ব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে) এবং সম্পূর্ণ খুলেও দিয়ো না (যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করে অপব্যয় করবে) নতুবা তিরস্কৃত (ও) রিক্ত হস্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। (কারও অভাব-অনটন দেখে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা বেশী রিযিক দান করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা ও উপযোগিতা) সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন, দেখেন। (সমগ্র বিশ্বের অভাব দূর করা রাব্বুল আলামীনেরই কাজ। তুমি এ চিন্তা কেন করবে যে, নিজেকে বিপদে ফেলে সবার অভাব-অনটন দূর করবে। এটা এজন্য অর্থহীন যে, সবকিছু করার পরও কারও অভাব দূর করা তোমার সাধ্যে কুলাবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ কারও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবে না বরং উদ্দেশ্য এই যে, সবার অভাব দূর করার সাধ্য কোন মানুষের নেই, যদিও সে নিজেকে যত বিপদে ফেলতেই সম্মত হোক। এ কাজ একমাত্র সৃষ্ট জগতের প্রভুর। তিনি সবার অভাব ও চাহিদা সম্পর্কে জানেন এবং সবার কল্যাণ সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। কখন, কোন্ ব্যক্তির, কোন্ অভাব কি পরিমাণ দূর করা উচিত তা তাঁরই জানা আছে। মানুষের কাজ শুধু মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা---খরচ করার জায়গায় কৃপণতা না করা এবং এত বেশী খরচ না করা যে, আগামীকাল নিজেই ফকীর হয়ে যায়, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আর পরে আক্ষেপ করতে হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযূলে ইবনে মারদওয়াইহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে

মাসউদের রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন ঃ অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল ঃ আম্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাযের সময় হল। হযরত বেলাল (রা) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভেতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ্র পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর ঃ এ আয়াত থেকে বাহ্যত এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন পাকের مَحْسُورًا শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎ-সাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে স্বীয় ধনসম্পদ নিঃশেষে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন কিছুই করেন নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ ঃ আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা কোন ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারক হয়ে পড়াও

বিশৃংখলা। (মাযহারী) مَلُومًا مَّحْسُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, مَلُوم শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَحْسُور শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে مَحْسُور অর্থাৎ শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝

(৩১) দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। (কেননা) সবার রিযিকদাতাই আমি। তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। (রিযিকদাতা তোমরা হলে এরূপ চিন্তা করতে পারতে) নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়ত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহেলিয়ত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্-তা'আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য

করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انما تنصرون وترزقون بضعفائكم অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়।

মাস'আলা ঃ কোরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আল্টে-পৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিযিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়ত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গোনাহ্ না হলেও এটা যে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝

(৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না (অর্থাৎ এর প্রাথমিক কারণাদি থেকেও বেঁচে থাক)। নিশ্চয় এটা (নিজেও) নিতান্ত অশ্লীল কাজ এবং (অন্যান্য অনিষ্টের দিক দিয়েও) মন্দ পথ! (কেননা, এর পরিণতিতে শত্রুতা, গোলযোগ এবং বংশবিকৃতি দেখা দেয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে اذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت অর্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন ঃ الحياء شعبة من الايمان (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়।

বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। একারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আযাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে।---(বাযযার)

হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-র বাচনিক অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।---(মাযহারী)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

(৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যে ব্যক্তির হত্যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে (হত্যা করা জায়েয। অর্থাৎ যখন কোন শরীয়তসম্মত বিধানের কারণে হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা জায়েয হয়ে যায়, তখন তা আর হারামের আওতায় থাকে না।)

যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার (সত্যিকার অথবা নিয়োজিত) উত্তরাধিকারীকে (কিসাস গ্রহণের) ক্ষমতা দান করেছি। অতএব হত্যার ব্যাপারে তার (শরীয়তের) সীমা লংঘন করা উচিত হবে না। [অর্থাৎ হত্যার নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতিরেকে হত্যাকারীকে হত্যা করবে না। হত্যাকারীর যেসব আত্মীয়-স্বজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়, শুধু প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে না। এছাড়া হত্যাকারীকেও শুধু হত্যাই করবে, নাক, কান অথবা হাত-পা কেটে 'মুসলা' (অঙ্গবিকৃত) করবে না কেননা] সে ব্যক্তি (কিসাসের সীমালংঘন না করলে শরীয়তের আইনে) আল্লাহ্‌র সাহায্যের যোগ্য। (আর সে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তবে অপর পক্ষ উৎপীড়িত হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র সাহায্যযোগ্য হওয়ার কদর করা এবং সীমালংঘন করে এ নিয়ামতকে বিনষ্ট না করা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্‌র কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এতৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।---(ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে آئس من رحمة الله অর্থাৎ এই লোকটিকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে।---(মাযহারী, ইবনে মাজা হইতে)

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়ার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক গোনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায় ; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফ্‌রী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে মুসলমান আল্লাহ্ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয় ; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। দুই. সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারে। তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কিসাস নেওয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার-প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও এক দিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে 'সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ওলী' লেখা হয়েছে।

অন্যায়ের জওয়াব অন্যায় নয়—ইনসাফ। অপরাধীর শাস্তির বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ এটা ইসলামী আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েয নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কিসাসের সীমালংঘন করে, তবে সে মযলুমের পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মযলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

মূর্খতা যুগের আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কিসাস হিসাবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না ; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না ; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। ইসলামী কিসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প ঃ একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের সর্বাধিক জালিম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষা-রোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাজ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ

করবেন। তাঁর আদালতে কোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে!

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

(৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম এর পরিণাম শুভ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতীমের মালের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্তু এমন পন্থায়, যা (শরীয়তের আইনে) উত্তম, যে পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে যায়। এবং (বৈধ) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় (কিয়ামতে) অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছে এবং মানুষের সাথে যেসব অঙ্গীকার করে থাকে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।) এবং (পরিমেয় বস্তুকে) যখন মেপে দাও তখন পুরোপুরি মেপে দাও এবং (ওজনের বস্তুকে) সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করে দাও। এটা (প্রকৃতই) উত্তম এবং এর পরিণাম শুভ। (পরকালে সওয়াব এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি, যা ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির উপায়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আর্থিক হক সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশ যথা---নবম, দশম ও একাদশতম নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বর্ণিত হয়েছে।

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা ঃ প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ এতে যেন শরীয়তবিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের হিফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। নিজেদের খেয়াল-খুশীতে অথবা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে ব্যয় করবে না। এ কর্মধারা ততদিন

অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হিফাযত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনর বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বছর।

অবৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ্ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। এক. যা বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে ; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে---দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক কিংবা কাফির। এছাড়া মু'মিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠিবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায় ; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গোনাহ্‌গার হবে। হাদীসে একে কার্যত নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ---অর্থাৎ কিয়ামতে অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে

যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফ্‌ফিফীনে উল্লিখিত আছে।

মাস'আলা ঃ ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা ঃ মাস'আলা— أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ তফসীর বাহ্‌রে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন ঃ এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ---এতে মাপ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। এক. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। দুই. এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ
لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ
سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

(৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তাকে কার্যে পরিণত করো না। (কেননা) কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ---এদের প্রত্যেকটিকেই (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে (যে কান ও চক্ষুকে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে? সেই কাজ ভাল ছিল, না মন্দ? প্রমাণহীন বিষয়ের কল্পনা অন্তরে কেন স্থান দিয়েছে?) এবং ভূ-পৃষ্ঠে গর্বভরে বিচরণ করো না। (কেননা) তুমি (ভূ-পৃষ্ঠে সজোরে পদক্ষেপ করে পদভারে) ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং (দেহকে উঁচু করে) পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে না। (উল্লিখিত) এসব মন্দ কাজ তোমার পালনকর্তার কাছে (সম্পূর্ণ) অপছন্দনীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বাদশতম ও ত্রয়োদশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোন বিষয়কে কার্যে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরী যে, জানার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। এক প্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের কোন সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পৌঁছা। এতে বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে। এমনিভাবে বিধানাবলীও দু'প্রকার। এক. অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানাবলী; যেমন আকায়েদ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ। এগুলোতে প্রথম স্তরের জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া আমল করা জায়েয নয়। দুই. ظنيات অর্থাৎ ধারণা প্রসূত বিধানাবলী; যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এই বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাট্য বিধানাবলীতে প্রথম স্তরের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আকায়েদ ও ইসলামী মূলনীতিসমূহে এরূপ জ্ঞান না হলে তার কোন মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসূত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। ---(বয়ানুল কোরআন)

কান চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ ঃ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ---এ আয়াতে বলা হয়েছে

যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ কানকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে ঃ তুমি সারা জীবনে কি কি দেখছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে ঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন ভিন্ন স্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুন্নাহ্‌বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ---অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানা-শোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে।

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে।

যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে---কর্ণ চক্ষু, নাসিকা, জিহ্‌বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যদ্দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহবা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দুটি ইন্দ্রিয় এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবত এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

দ্বিতীয় আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই ঃ ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যদ্দ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টানকরে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ্‌। মানুষের ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।---(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ---(মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রার এক রেওয়ায়েতে হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ বলেন ঃ বড়ত্ব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (চাদর ও লুঙ্গি বলে পোশাক বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব বিশিষ্টও নন যে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহ্‌র মহত্ত্বগুণ বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণে আল্লাহ্‌র শরীক হতে চায় সে জাহান্নামী।)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ যারা অহংকার করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিঁপিলিকার সমান মানবাকৃতিতে উত্থিত করা হবে। তাদের উপর

চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা প্রকোষ্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, যার নাম বুলস। তাদের উপর প্রখরতর অগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি দেওয়া হবে।---(তিরমিযী)

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) একবার এক ভাষণে বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট; কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়।---(মাযহারী)

উল্লিখিত নির্দেশাবলী বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ---অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহ্র কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে ; যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি ; যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা ; অর্থাৎ পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কছেদ করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

হুঁশিয়ারি ঃ পূর্বোল্লিখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহ্র হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার-সংক্ষেপ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।---(মাযহারী)

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۭ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۭ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ
صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۭ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾ قُلْ
لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ
سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ
السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

(৩৯) এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথাবার্তা বলছ। (৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে (৪৪) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা), এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশাবলী] ঐ হিকমতের অংশ, যা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। নতুবা তুমি অভিযুক্ত, বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (উল্লিখিত নির্দেশাবলী প্রদানের সূচনাও তওহীদের বিষয়বস্তু দ্বারা করা হয়েছিল এবং শেষও এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। এরপরও তওহীদের বিষয়বস্তু

বর্ণিত হচ্ছে যে, পূর্বে যখন শিরকের মন্দ ও বাতিল হওয়া জানা গেল, তখন এরপরও কি তোমরা তওহীদের পরিপন্থী বিষয়াদিতে বিশ্বাস কর? উদাহরণত) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং নিজে ফেরেশতাদেরকে (নিজের) কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? (আরবের মূর্খরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যারূপে আখ্যায়িত করত। এটা দু'কারণে বাতিল। আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত এবং দুই, সন্তান ও কন্যাসন্তান যাদেরকে কেউ নিজের জন্য পছন্দ করে না---অকেজো বলে মনে করে। এর ফলে আল্লাহ্‌কে আরও একটি দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।) নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর কথা বলছ। (পরিতাপের বিষয় যে, শিরকের খণ্ডন ও তওহীদের বিষয়বস্তুকে) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা বুঝে নেয়। (বিভিন্ন পন্থায় বারবার তওহীদের বিষয়বস্তু সপ্রমাণ এবং শিরক বাতিল করা সত্ত্বেও তওহীদের প্রতি) তাদের অনীহাই কেবল বৃদ্ধি পায়। আপনি (শিরক বাতিল করার জন্য তাদেরকে) বলুন ঃ যদি তাঁর (সত্য উপাস্যের) সাথে অন্য উপাস্যও (অংশীদার) হত; যেমন তারা বলে, তবে তদবস্থায় আরশের মালিক (সত্যিকার আল্লাহ্‌) পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা তারা (অর্থাৎ অন্য উপাস্যরা করবে) বের করে নিত। (অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কর, যদি তারা বাস্তবিকই অংশীদার হত, তবে আরশের মালিক আল্লাহ্‌কে আক্রমণ করে বসত এবং পথ খুঁজে নিত। যখন কথিত উপাস্য শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বেঁধে যেত, তখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলতে পারত। অথচ দুনিয়া যে একটি অটল ব্যবস্থার অধীনে চালু রয়েছে, তা প্রত্যেকের দৃষ্টির সামনে বর্তমান আছে। তাই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা বিশুদ্ধভাবে চালু থাকাই এ বিষয়ের প্রমাণ হল যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ তাঁর অংশীদার নেই। এ থেকে প্রমাণিত হল যে) তারা যা কিছু বলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তা থেকে পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে। (তিনি এমন পবিত্র যে) সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু (ফেরেশতা, মানুষ ও জিন) রয়েছে সবাই (ব্যক্তরূপে অথবা অবস্থাগতভাবে) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং (এই পবিত্রতা বর্ণনা) শুধু বিবেকবান মানুষ ও জিনরাই করে না; কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্‌ (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনাকে) বোঝ না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذًا لَّابْتَغَوْا আয়াতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ্‌ না হন; বরং তাঁর আল্লাহ্‌তে অন্যরাও শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কালাম শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির

ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

যমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ : ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জিনদের তসবীহ্ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্বল্যমান---সবারই জানা। কাফির মানব ও জিন বাহ্যত তসবীহ্ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্য বস্তু, যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তসবীহ্ পাঠ করার অর্থ কি? কোন কোন আলিম বলেন : তাদের তসবীহ্ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তসবীহ্। অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করেছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোন বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তসবীহ্।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফিররাও সাধারণভাবে আল্লাহ্কে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিস্ট বাহ্যত আল্লাহ্র অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ করছে; যেমন বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কোরআন পাকের وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়---সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির ঊর্ধ্বে।---(কুরতুবী)

হাদীসে একটি মু'জিযা উল্লিখিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতের তালুতে কংকরের তসবীহ্ পাঠ সাহাবায়ে কিরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে মু'জিযা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে-কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন : কংকরসমূহের তসবীহ্ পাঠ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে, সেখানেই তসবীহ্ পাঠ করে; বরং মু'জিযা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ্ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণত সূরা সাদে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে : إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

—অর্থাৎ আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তসবীহ্ পাঠ করে। সূরা বাক্বারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ---অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহ্র ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্র ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খৃস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে ঃ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ---অর্থাৎ এরা আল্লাহ্র জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফ্রী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ্কে স্মরণ করে---এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ---অতঃপর বলেন ঃ এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, পাহাড় কুফ্রী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে, কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহ্র যিকর শোনে না এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন জিন, মানব, পাথর ও ঢিলা এমন নেই, যে মুয়াযযিনের আওয়ায শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়।---(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইবনে মাজা)

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমরা খাওয়ার সময় খাদ্যের তসবীহ্র শব্দ শুনতাম। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে খানা খেলে খাদ্যের তসবীহ্র শব্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি মক্কার ঐ পাথরটিকে চিনি, যে নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি। কেউ কেউ বলেন ঃ এই পাথরটি হচ্ছে "হাজরে-আসওয়াদ।"

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। হান্নানা স্তম্ভের কাহিনী তো সকল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিম্বর তৈরী হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন একে ছেড়ে মিম্বরে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কান্নার শব্দ সাহাবায়ে কিরামও শুনেছিলেন।

এসব রেওয়ায়েত দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তু সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করে। ইব্রাহীম (আ) বলেনঃ প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক সব বস্তুর মধ্যেই এই তসবীহ্ বিদ্যমান আছে। এমন কি, দরজার কপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তসবীহ আছে। ইমাম কুরতুবী বলেনঃ তসবীহ্‌র অর্থ অবস্থাগত তসবীহ হলে উপরোক্ত আয়াতে হযরত দাউদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাগত তসবীহ প্রত্যেক চেতনাশীল মানুষ প্রত্যেক বস্তু থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উক্তিগত তসবীহ। খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থের বরাত দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংকরদের তসবীহ পাঠে মু'জিযা ছিল না। ওরা তো সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তসবীহ পাঠ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযা ছিল এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ এমন শব্দময় হয়ে ওঠে, যা সাধারণ মানুষেরও শ্রুতিগোচর হয়। এমনিভাবে পাহাড়-সমূহের তসবীহ্ পাঠও হযরত দাউদ (আ)-এর মু'জিযা এ হিসাবেই ছিল যে, তাঁর মু'জিযায় ঐ তসবীহ্ কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي
آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ
نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ
نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ انظُرْ
كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

(৪৫) যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পর-কালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণ কুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখনও অনীহাবশত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জালিমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখুন ওরা আপনার জন্য কেমন উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে; অতএব ওরা পথ পেতে পারে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কোরআনে তওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণসহ বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও হতভাগা মুশরিকরা তা মানে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে ওদের না মানার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ওরা এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করে না; বরং এগুলোকে ঘৃণা ও বিদ্রূপ করে। ফলে ওদেরকে সত্যের জ্ঞান থেকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপ এরূপ ঃ)

যখন আপনি (তবলীগের জন্য) কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও ওদের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল করে দেই, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না। (পর্দা এই যে) আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দেই, যাতে ওরা একে (অর্থাৎ কোরআনের উদ্দেশ্যকে) না বোঝে এবং ওদের কানের উপর বোঝা চাপিয়ে দেই। (যাতে ওরা একে হিদায়ত অর্জনের জন্য না শুনে। উদ্দেশ্য এই যে, সেই পর্দাটি হচ্ছে ওদের না বোঝার এবং বোঝার ইচ্ছাই না করার। বোঝার ইচ্ছা করলে ওরা আপনার নবুয়ত চিনতে পারত)। যখন আপনি কোরআনে শুধু স্বীয় পালনকর্তার (গুণাবলী) উল্লেখ করেন (এবং ওরা যেসব উপাস্যের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে সেইসব গুণ নেই) তখন তারা (নির্বুদ্ধিতা বরং বক্র বুদ্ধিতার কারণে) ঘৃণাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (অতঃপর তাদের এই কুকর্মের জন্য শাস্তির খবর বর্ণিত হয়েছে যে) যখন তারা আপনার দিকে কান লাগায়, তখন আমি ভালভাবেই জানি, যে নিয়তে তারা শুনে (সেই নিয়ত হচ্ছে, আপত্তি উত্থাপন করা, দোষারোপ করা এবং সমালোচনা করা) এবং যখন ওরা (কোরআন শুনার পর) পরস্পর কানাকানি করে (আমি তাও ভালভাবেই জানি) যখন জালিমরা বলে ঃ তোমরা তো [অর্থাৎ ওদের মধ্য থেকে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেছে] এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ, যার উপর যাদুর (বিশেষ) ক্রিয়া [অর্থাৎ পাগলামির ক্রিয়া) হয়েছে। অর্থাৎ তার অদ্ভুত কথাবার্তা সবই মস্তিষ্কবিকৃতির ফল। হে মুহাম্মদ (সা)] দেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপাধি বের করেছে। অতএব ওরা (সম্পূর্ণই) পথভ্রান্ত হয়ে গেছে। এখন ওরা (সত্য) পথ পেতে পারবে না। (কেননা, এ ধরনের হঠকারিতা ও জেদ, বিশেষত আল্লাহ্র রসূলের সাথে এ রকম ব্যবহারের কারণে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও হিদায়তপ্রাপ্তির যোগ্যতা লোপ পায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরের ওপর যাদুর ক্রিয়া হতে পারে ঃ পয়গম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ও ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের ওপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে, জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফিররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম তাই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে

ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন তা'ই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুযূল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন ঃ কোরআনে যখন সূরা লাহাব নাযিল হয়, যাতে আবূ লাহাবের স্ত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবূ বকর (রা) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন ঃ আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন ঃ না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলতে লাগল ঃ আপনার সঙ্গী আমার 'হিজু' (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। তার প্রস্থানের পর হযরত আবূ বকর আরয করলেন ঃ সে কি আপনাকে দেখেনি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল ঃ হযরত কা'ব বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই ঃ এক আয়াত---সূরা কাহাফের إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহলের---أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً -

হযরত কা'ব বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশত রোম দেশে গমন করেন। বেশ

কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকট মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে গেল। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলা-ফিরা করছিল ; কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবী বলেন ঃ হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 'রায়' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াত-গুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান; বরং তাদের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করতে করতে যান; কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই ঃ

يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ۭ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَاۗؤُهُمْ فَهُمْ
غٰفِلُوْنَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ
اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ
اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে "লোকটি কোন শয়তান হবে"

বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল। বলা বাহুল্য তারা আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। (কুরতুবী)

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا
جَدِيْدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ
صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۭ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ
فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۭ قُلْ عَسٰٓى اَنْ
يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ
لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٢﴾

(৪৯) তারা বলেঃ যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৫০) বলুনঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবেঃ আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে? বলুনঃ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবেঃ এটা কবে হবে? বলুনঃ হবে, সম্ভবত শীঘ্রই। (৫২) যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলেঃ তখন আমরা (মৃত্যুর পর) অস্থি এবং (অস্থি থেকেও অতঃপর) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি (এরপর কিয়ামতে) নতুনভাবে সৃজিত ও জীবিত হব? (অর্থাৎ প্রথমত মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াই কঠিন। কারণ দেহে জীবন-ধারণের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। এরপর দেহও যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন এর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টি কে মেনে নিতে পারে)? আপনি (উত্তরে) বলে দিনঃ (তোমরা তো অস্থি জীবিত হওয়াকেই অসম্ভব মনে করছ; কিন্তু আমি বলি যে তাহলে) তোমরা পাথর কিংবা এমন ধরনের কোন বস্তু হয়ে দেখে নাও, যা তোমাদের মনে (জীবন ধারণের উপযুক্ততা থেকে) অনেক দূরবর্তী। (এরপর দেখ যে, জীবিত হও কিনা। বলা বাহুল্য, পাথর ও লোহা জীবন থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণ এই যে, এদের

মধ্যে কোন সময়ই জৈব জীবন সঞ্চারিত হয়নি। অস্থি এর বিপরীত। কারণ, এর মধ্যে পূর্বে জীবন ছিল। অতএব পাথর ও লোহাকে জীবিত করা যখন আল্লাহ্‌র জন্যে কঠিন নয়, তখন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পুনর্বার জীবন দান করা কিরূপে কঠিন হবে? আয়াতে كُونُوا আদেশ সূচক পদ বলে شرط ও تعليق বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তোমরা পাথর কিংবা লোহাও হয়ে যাও, তবে এমতাবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম)। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? আপনি বলে দিন ঃ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে দু'টি জিনিস জরুরী। এক, উপকরণ ও পাত্রে অস্তিত্ব লাভের যোগ্যতা। দুই, তাকে অস্তিত্ব দানকারী শক্তি। প্রথম প্রশ্নটি ছিল পাত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহ জীবন ধারণের যোগ্য থাকে না। এর উত্তর দিয়ে পাত্রের যোগ্যতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল জীবন দানকারী শক্তি সম্পর্কে; অর্থাৎ কোন কর্তা স্বীয় কর্তৃত্বের বলে এই আশ্চর্যজনক কাজটি করবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যিনি প্রথমে তোমাদেরকে এমন উপকরণ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে জীবন ধারণের যোগ্যতা আছে বলে কারও ধারণাও ছিল না। অতএব তার জন্যে পুনর্বার সৃষ্টি করা কিরূপে কঠিন হবে? যখন পাত্র ও কর্তা সম্পর্কিত উভয় প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল, তখন পুনর্জীবনের ঘটনাটি কখন ঘটবে, তা জানার জন্যে) তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে নেড়ে বলবে ঃ (আচ্ছা বলুন তো) এটা (অর্থাৎ জীবিত হওয়া) কবে হবে? আপনি বলে দিন, সম্ভবত এটা নিকটবর্তী। (অতঃপর ঐসব অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো নতুন জীবন লাভের সময় দেখা দেবে)। এটা ঐদিন হবে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (জীবিত করা ও হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে ফেরেশতার মাধ্যমে) ডাক দেবেন এবং তোমরা (বাধ্যতামূলকভাবে) তাঁর প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিতও হয়ে যাবে)। এবং (ঐ দিনের ভয়ভীতি দেখে তোমাদের অবস্থা হবে এই যে, দুনিয়ার গোটা বয়স ও কবরে অবস্থানের সময় সম্পর্কে) তোমারা অনুমান করবে যে, খুব কম সময়ই (দুনিয়াতে) অবস্থান করেছ। (কেননা আজকের ভয়ংকরতার তুলনায় দুনিয়া ও কবরে কিছু না কিছু সুখ ছিল। বলা বাহুল্য, বিপদে পড়ার পর সুখের যমানা মানুষের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত মনে হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ — يَدْعُو শব্দটি دُعَاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে

হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ ছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর।---(কুরতুবী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না)।

হাশরে কাফিররাও আল্লাহ্র প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে ঃ

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ঃ اِسْتِجَابَتْ শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে।

بِحَمْدِهِ ঃ অর্থাৎ ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্র প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মু'মিন ও কাফির সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহ্লে কাফিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেন ঃ কাফিররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِهِ ঃ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না---(কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মু'মিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফিরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে ঃ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا হায় আফসোস, কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে! অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ হায় আফসোস, আমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে ওঠবে। পরে কাফিরদেরকে মু'মিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে---وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফিরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী উচ্চারিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্‌দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্‌দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্‌দের মাধ্যমে হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য।

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

(৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের প্রতি রহম করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। (৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি আমার (মুসলমান) বান্দাদেরকে বলে দিন, (যদি কাফিরদেরকে জওয়াব দেয় তবে) তারা যেন ঐ কথাই বলে, যা (নৈতিক দিক দিয়ে) উত্তম (অর্থাৎ গালি-গালাজ, কঠোরতা ও উত্তেজনাপূর্ণ কথা না হওয়া চাই। কেননা) শয়তান (কড়া কথা বলিয়ে) লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (এ শিক্ষাদানের কারণ এই যে, কঠোরতা দ্বারা কোন সময় কার্যোদ্ধার হয় না। হিদায়ত ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুসারী)। তোমাদের সবার অবস্থা তোমাদের পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন (যে, কে কিসের যোগ্য)। তিনি যদি চান, তোমাদের (মধ্য থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) রহম করবেন (অর্থাৎ হিদায়ত করবেন)। অথবা তিনি যদি চান তোমাদের (মধ্য থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) আযাব দেবেন (অর্থাৎ তাকে তওফীক ও হিদায়ত দেবেন না)। আমি আপনাকে (পর্যন্ত) তাদের (হিদায়তের) জন্য দায়ী করে প্রেরণ করিনি। নবী (হওয়া সত্ত্বেও যখন আপনাকে দায়ী করা হয়নি ; তখন অন্যের কি সাধ্য ? কাজেই পীড়াপীড়ি ও কঠোরতা করা নিষ্প্রয়োজন)। আপনার পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন তাদেরকে (ও), যারা আকাশসমূহে রয়েছে এবং (তাদেরকেও, যারা) ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। (আকাশের অধিবাসী বলে ফেরেশতাদেরকে এবং ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী বলে মানব ও জিন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভালভাবেই জানি, তাদের মধ্যে কে নবী ও রসূল হওয়ার যোগ্য এবং কে অযোগ্য। তাই আমি যে আপানাকে নবী বানিয়েছি, এতে আশ্চর্যের কি রয়েছে ?) এবং (এমনিভাবে যদি আমি আপনাকে অন্য পয়গম্বরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকি, তবে আশ্চর্যের কি আছে ? কেননা) আমি (পূর্বেও) কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (এবং এমনিভাবে আমি যদি আপনাকে কোরআন দিয়ে থাকি, তবে তা আশ্চর্যের বিষয় হল কিরূপে ? কেননা আপনার পূর্বে) আমি দাউদকে যবুর দান করছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফিরদের সাথেও জায়েয নয় ঃ প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

کہ بے حکم شرع آب خوردن خطا ست
وگر خون بفتوی بریزی رواست

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটুকথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হিদায়ত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম-কুরতুবী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত উমর (রা)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়।

ঘটনা ছিল এই ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন। ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ----এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, যবুর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ বর্তমান প্রচলিত যবুরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

(তফসীরে হক্কানী)

ইমাম বগভী স্বীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন ঃ যবুর আল্লাহ্র গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশো পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হাম্দ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরয কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ
الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۭ اِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝ وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۭ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

(৫৬) বলুন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর। অথচ ওরা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (৫৭) যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই

তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কাঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলে দিন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা (উপাস্য) মনে করছ, যেমন ফেরেশতা ও জিন) তাদেরকে (নিজেদের কষ্ট দূর করার জন্য) ডাক। অতএব তারা না তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে এবং না তা পরিবর্তন করার (উদাহরণত কষ্ট সম্পূর্ণ দূর করতে না পারলে তা কিছুটা হালকা করে দেবে)। মুশরিকরা যাদেরকে (অভাব পূরণ এবং বিপদ দূর করার জন্য) ডাকে, তারা স্বয়ং পালনকর্তার দিকে (পৌঁছার জন্য) মধ্যস্থতা তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্যশীল হয় (অর্থাৎ তারা স্বয়ং ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল---যাতে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হয় এবং তারা চায় যে, নৈকট্যের স্তর আরও উন্নীত হোক।) তারা তাঁর রহমত প্রার্থনা করে এবং (অবাধ্যতা করলে) তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার আযাব ভয় করার মতই। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন স্বয়ং ইবাদতকারী, তখন মাবুদ কিরূপে হতে পারে? তারা নিজেরাই যখন কোন অভাব অনটন ও কষ্ট দূর করার ব্যাপারে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, তখন তারা অপরের অভাব-অনটন কিরূপে দূর করতে পারবে?) এবং (কাফিরদের) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করে দেব না অথবা (কিয়ামতের দিন) তাকে (অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে দোযখের) কঠোর শাস্তি দেব না। এ বিষয়টি গ্রন্থে (অর্থাৎ লওহে মাহ্ফূযে) লিখিত আছে। (সুতরাং কোন কাফির এখানে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলেও কিয়ামত দিবসের ভীষণ শাস্তি থেকে বাঁচবে না। স্বাভাবিক মৃত্যু দ্বারা তো শুধু কাফিররাই ধ্বংস হয় না---সবাই মৃত্যুবরণ করে। তাই জনপদ ধ্বংস করার কথা বলে এখানে আযাব ও বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। মোটকথা এই যে, কাফিরদের উপর তো কোন কোন সময় দুনিয়াতেও আযাব প্রেরণ করা হয় এবং পরকালের আযাব এরও অতিরিক্ত হবে। আবার কোন সময় দুনিয়াতে কোন আযাবই আসে না। কিন্তু পরকালের আযাব থেকে সর্বাবস্থায় মুক্তি নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وسيلة—يبتغون الى ربهم الوسيلة শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারও কাছে পৌঁছার উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্র জন্য ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহ্র মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ

করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ---হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা---মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।---(কুরতুবী)

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ۭ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۭ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ۭ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۭ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝

(৫৯) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্য সামূদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৬০) এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমার পক্ষ থেকে বিশেষ (ফরমায়েশী) মু'জিযাসমূহ প্রেরণে এটাই প্রতিবন্ধক যে, (তাদের সমধর্মী) পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোকে (অর্থাৎ ফরমায়েশী মু'জিযাসমূহকে মিথ্যারোপ করেছে। সব কাফিরের মেযাজ ও স্বভাব এক-রকম। তাই বাহ্যত বোঝা যায় যে, এরাও মিথ্যারোপ করবে)। এবং (নমুনা হিসাবে একটি কাহিনীও শুনে নাও যে) আমি সামূদ সম্প্রদায়কে [তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী সালেহ (আ)-এর মু'জিযা হিসাবে] উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, (যা উদ্ভূত উপায়ে পয়দা হয়েছিল এবং) যা (মু'জিযা হওয়ার কারণে) জ্ঞানলাভের উপায় ছিল। অতঃপর তারা (এ থেকে জ্ঞান অর্জন করেনি;

বরং) তার প্রতি জুলুম করেছে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করেছে। কাজেই বর্তমান (লোক-দেরকে ফরমায়েশী মু'জিযা দেখানো হলে তারাও তদ্রূপ করবে)। আমি মু'জিযাসমূহ শুধু (এ বিষয়ে) ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করি (যে যদি এই মু'জিযা দেখেও বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে অনতিবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। যাদেরকে ফরমায়েশী মু'জিযা দেখানো হয়েছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে এটাই তাদের ধ্বংস ও আযাবের কারণ হয়ে গেছে। তবে এদেরকে এই মুহূর্তে ধ্বংস না করাই আল্লাহ্র রহস্যের তাগিদ। তাই তাদের ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ করা হয়নি। সে ঘটনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়, যার সম্মুখীন তারা পূর্বে হয়েছে। এর বর্ণনা এরূপ ঃ) আপনি স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা (স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সব মানুষকে (অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাসমূহকে) পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন। (ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাও আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে, যার এক প্রমাণ তাদেরই এ ঘটনা যে) আমি (মি'রাজের ঘটনায়) যে দৃশ্যা-বলী (জাগ্রত অবস্থায়) আপনাকে দেখিয়েছিলাম এবং যে বৃক্ষের কোরআনে নিন্দা করা হয়েছে (অর্থাৎ কাফিরদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ) আমি এই উভয় বস্তুকে তাদের জন্য গোমরাহীর কারণ করে দিয়েছি। (অর্থাৎ তারা উভয় ব্যাপার শুনে মিথ্যারোপ করেছে। মি'রাজকে মিথ্যারোপ করার কারণ ছিল এই যে, এক রাত্রিতে সিরিয়ায় গমন করা, অতঃ-পর আকাশে যাওয়া তাদের কাছে সম্ভবপর ছিল না। যাক্কুম বৃক্ষকে মিথ্যারোপ করার কারণ ছিল এই যে, বৃক্ষটি দোযখে রয়েছে বলা হয়। অথচ আগুনের মধ্যে বৃক্ষ থাকা অসম্ভব। থাকলেও তা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। অথচ এক রাত্রিতে সুদীর্ঘ পথ সফর করা যুক্তিগতভাবে যেমন অসম্ভব নয় তেমনি আকাশে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এমনিভাবে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি যদি আল্লাহ্ তা'আলা এমন করে দেন যে, সে পানির পরিবর্তে আগুনে লালিত-পালিত হয়, তবে এটা অসম্ভব হবে কিরূপে)? আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, কিন্তু তাদের অবাধ্যতা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। (যাক্কুম বৃক্ষ অস্বীকার করার সাথে সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত। সূরা সাফফাত-এ এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা আসবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ---অর্থাৎ শবে-মি'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফিতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ফিতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে ; অর্থাৎ গোমরাহী। এর এক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়শা, সুফিয়া হাসান, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেন ঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফিতনা। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন শবে মি'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা